বাংলা কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের নববীক্ষণ

পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

মুনমুন দাস

রেজিস্ট্রেশন: ১১ই জুলাই, ২০১৪। রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00BE1100214

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সত্যবতী গিরি

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

এবং

ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১

ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ষোড়শ শতক থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর ধরে চৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙালি মানস পরিমণ্ডলকে বিচিত্র দিকে সম্প্রসারিত করেছে। ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে একটি দেশের জাতীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে, সর্বোপরি সাহিত্য ধারায় যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হতে দেখা যায় তাকে অনেকেই 'চৈতন্য রেণেসাঁস' বলে অভিহিত করেছেন। আর এই রেণেসাঁস বা নবজাগরণের প্রভাব কেবল ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। ঊনবিংশ-বিংশ-একবিংশ শতকেও এই চৈতন্য রেঁণেসাসের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে বাংলা সাহিত্যে নিরন্তর চৈতন্যচর্চার মধ্যে দিয়ে। ড. সত্যবতী গিরির মতে, "উনবংশ শতাব্দীর নবজাগরণ যুগেও চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বাঙালির সাহিত্য সৃজনের বিচিত্র শাখাকে দেশীয় ঐতিহ্যের ভাবপ্রেরণায় পুষ্ট করেছে।"[১]

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, গল্প এমনকি উপন্যাসেও চৈতন্যদেবের গভীর প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বাংলা কথাসাহিত্যে। বিংশ ও একবিংশ শতকে তাঁকে নিয়ে রচিত হয়ে চলেছে একের পর এক উপন্যাস, ছোটগল্প। আধুনিক কথাসাহিত্যকদের হাত ধরে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে চৈতন্যদেবের জীবনের নানা দিক নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কীভাবে উঠে এসেছে তাই যুক্তি-তথ্যের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ ও আলোচনার চেষ্টা করেছি এই গবেষণা পত্রে। চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্য জগতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে, কীভাবে আধুনিক কথাশিল্পীদের কলমে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ, বিনির্মাণ ঘটে চলেছে, চৈতন্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা কীভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে, নববীক্ষণে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের সেই প্রভাব অন্বেষণই এই গবেষণা পত্রের অন্বিষ্ট।

প্রথম অধ্যায়: শ্রীচৈতন্য জীবনকথা

প্রথম অধ্যায়ে আমরা চৈতন্যদেবের অলোকসামান্য মহাজীবনের একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, তার বংশপরিচয়, নিমাইয়ের নামকরণ, বাল্যলীলা, বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ, পাণ্ডিত্য, অধ্যাপনা, পূর্ববঙ্গে গমন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, কাজীদলন এবং নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভৃতি নিমাইয়ের নবদ্বীপ লীলা যেমন বর্ণনা করেছি তেমনি নিমাইয়ের সন্ন্যাস পরবর্তী নীলাচল গমন, দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ, গৌড়যাত্রা, রূপ-সনাতন উদ্ধার, পুরীতে আগমন, জগন্নাথ দর্শন, সার্বভৌম উদ্ধার, রায়-রামানন্দের সঙ্গে মিলন, স্বরূপ দামোদরের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত কথন প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের নীলাচল পর্ব এবং তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থা ও তাঁর তিরোধান সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়: চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির পরিচয় ও প্রাসঙ্গিকতা

চৈতন্যদেবের এই মহাজীবনের কথা আমরা জানতে পারি বিভিন্ন চৈতন্যচরিতকাব্য থেকে। মধ্যযুগে যেখানে সাহিত্য হয়ে উঠেছিল দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন, ধর্ম ও অলৌকিকতায় পূর্ণ সেখানে চৈতন্য জীবনী সাহিত্যে এল মানুষ। শুধু মানুষ নয়, সেই মানুষের গৃহ, পরিবার, সমাজ ও সমসাময়িক পরিবেশের কথা। এই গ্রন্থগুলি থেকে তৎকালীন সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিচয় পাওয়া যায় যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পক্ষেই যে এক বিশেষ সম্পদ তাই নয়, এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ বা ক্ষীণ সংকেতও আমরা পেয়ে থাকি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে , " কাব্যে, ধর্ম-গ্রন্থে, ... যেখানেই লেখকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজের একটি বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয় ... সেখানেই উপন্যাসের ভাবী ছায়াপাত হইয়া থাকে।"[২] আর এই চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আধুনিক কথাসাহিত্যিক কল্পনা ও

বাস্তবের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সম্ভাবতাকে আখ্যানভাগে বিন্যস্ত করে উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংরূপে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের বিনির্মাণ করেছেন। তাই আমাদের গবেষণায় প্রাসঙ্গিক ভাবেই চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংস্কৃত ও বাংলায় রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের উপাদানগুলি কীভাবে কথাশিল্পীদের শিল্পিত সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে নবতর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। 'চৈতন্যভাগবতে' বৃন্দাবন দাস চৈতন্যচরিত্রে করুণ কোমলতার সঙ্গে একটা রুদ্র কঠিন মূর্তিও অঙ্কণ করেছেন যার পরিচয় আমরা পাই জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং কাজী দলনের মতো ঘটনায়। এইখানে চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে যে গণ আন্দোলনের পটভূমি রচিত হয়েছিল, চৈতন্যদেবের সেই প্রতিবাদী গণশক্তির জাগরুক সত্তার পরিচয়ই পরবর্তী উপন্যাসে নায়করূপে চৈতন্যচরিত্র নির্মাণের উপাদান হয়ে উঠেছে যার পরিচয় আমরা পাই কালকূটের 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য', ড. দীপকচন্দ্রের 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' প্রভৃতি উপন্যাসে।

আবার জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গলে' চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে সেই সময়ে দাঁড়িয়েও সাহসিকতার সঙ্গে একটি বাস্তব কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। জয়ানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী "আষাঢ় বঞ্চিতা রথ বিজয় নাচিতে।/ ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে।।/ ······ চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠী দিবসে।/ সেই লক্ষে টোটাএ শয়ন অবশেষে।।/ পণ্ডিত গোসাইকে কহিল সর্ব্বকথা।/ কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা।।··· মায়া-শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।/ চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।।"[৩] চৈতন্যদেবের মৃত্যু সংক্রান্ত জয়ানন্দের এই তথ্যটি ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও আধুনিক পাঠক সমালোচকের কাছে অনেক বেশি যুক্তিসম্মত বিশ্বাসযোগ্য। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে বিংশ ও একবিংশ শতকে বহুবিধ চর্চা শুরু হয়। ১৯৭৬ সালে ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় প্রথম এ বিষয়ে উপন্যাস লিখলেন 'কাঁহা গেলে তোমা পাই'। এরপর ২০১৩ সালে রূপক সাহা লিখলেন 'ক্ষমা কর হে প্রভু'। এইভাবে চৈতন্যচরিত সাহিত্যের উপাদানকে কেন্দ্র করে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তার প্রসার ঘটতে থাকে আধুনিক উপন্যাস ও ছোটগল্পে।

তৃতীয় অধ্যায় : ঊনবিংশ শতকের কথাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব

বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম যর্থাথ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরেই বাংলা উপন্যাস শিল্পের আবির্ভাব। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতকের রেণেসাঁস যুগের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র পজিটিভ যুক্তিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। 'আনন্দমঠে'র সন্তানরা যে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত তা চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চৈতন্যদেবের ইষ্টদেবতা প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ, সন্তানদের ইষ্টদেবতা শক্তিময়, দুষ্টের দমনকারী অসুর সংহারী শ্রীবিষ্ণু। তাই সত্যানন্দের মনে হয়েছে "চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে – উহা অর্ধেক মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময় – কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন – তিনি অনন্ত শক্তিময়। ··· আমরা উভয়েই বৈষ্ণব – কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব।"[৪] বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে কীভাবে চৈতন্যদেবের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে, শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম থেকে 'আনন্দমঠে'র সন্তানদের পালিত তথা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসৃত বৈষ্ণব ধর্মের পার্থক্য কোথায় ও কেন; 'মৃণালিনী' ও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কীভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসঙ্গ এসেছে তাই নিয়েই আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায় : বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের প্রতিফলন

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের প্রতিফলন অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ লেখকদের উপন্যাসে কীভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে চৈতন্য প্রসঙ্গ, চৈতন্যদেবের উদার প্রেমনীতির অনুপ্রেরণায় উপন্যাসের চরিত্রগুলি কীভাবে নতুন মাত্রা পেয়েছে, গ্রাম বাংলার বাউল-বোষ্টম-বৈষ্ণবদের জীবনে চৈতন্য প্রবর্তিত নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাই কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ : রবীন্দ্র সাহিত্যে ও জীবনদর্শনে নববীক্ষণে চৈতন্য

চৈতন্যদেবের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং উদার প্রেমভক্তির বিরাট মানবিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যে বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।"[৫] সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে চৈতন্য যে ভালবাসার ধর্মে জাতিকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন "…… আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। …দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু-মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না।"[৬] চৈতন্যদেবের মতো রবীন্দ্রনাথও হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে মানবতার জয়গান রচনা করেছেন। শুধু তাই নয় চৈতন্য প্রবর্তিত এই ঐক্যবোধ জাতির জীবনে পুনরায় ফিরে আসবে বলে রবীন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করে বলেছেন – "তাই আশা হইতেছে, আর একদিন হয়তো আমরা একই মত্ততায় পাগল হইয়া সহসা এক জাতি হইয়া উঠিতে পারিব। বৈঠকি ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্তন গাহিতে পারিব। …সেই আর একদিন বাংলা একাকার হইবে।"[৭] এ থেকে বোঝা যায় চৈতন্যদেব যে ভাবান্দোলনের দূত হয়ে এসেছিলেন, বৈঠকি ধ্রুপদ ছেড়ে রাজপথী কীর্তনের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, উনিশ শতকের পরাধীন চেতনায় সেই ভাবান্দোলনের প্রাণশক্তিকে, সেই একাত্মবোধের প্রমত্ততাকে ঐতিহাসিক কারণেই রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে চাইছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের দাসত্ব থেকে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, স্বাধীন হবার জন্যে যে বৃহৎ ভাবের সঙ্গে একাত্মবোধের প্রয়োজন ছিল সেই চিন্তার সূত্রেই চৈতন্যদেবের ভাবান্দোলন রবীন্দ্রনাথের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যদেবের বিস্তৃত মানবপ্রেমের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এখানেই।

রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গেও কীভাবে বার বার চৈতন্য অনুষঙ্গ , বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যবহার রবীন্দ্র মানসে চৈতন্য চেতনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় তাও আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কেবল তাই নয়, তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের চরিত্রগুলির উপরও চৈতন্যব্যক্তিত্বের প্রভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। যেমন 'গোরা' উপন্যাসে গোরার

রূপচিত্র ও চরিত্র গঠনে চৈতন্যদেবের প্রভাব, 'ঘরে-বাইরে' নিখিলেশের বিচ্ছেদ যন্ত্রনা বোঝাতে বিদ্যাপতির পদের ব্যবহার, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে লীলানন্দ স্বামীর উপাখ্যানে বৈষ্ণব ধর্মের গুরুবাদী সাধনার স্বরূপ উন্মোচন ও রসচর্চার ভয়ঙ্কর পরিণতির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন; এছাড়া 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে বসন্ত রায় চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্গীতের মাধুর্য প্রকাশ, শত্রুকে মিত্র করে তোলা, সংঘর্ষের পরিবর্তে শান্তির বার্তা প্রচার, 'রাজর্ষি' উপন্যাসে অহিংস প্রেমধর্মের জয় ঘোষণা, আর এই অহিংস প্রেমধর্মই বৈষ্ণব ধর্মের তথা চৈতন্য ধর্মের মূল কথা প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে কীভাবে বার বার বিবিধ অনুষঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তাই আমরা এই পরিচ্ছেদে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তারাশঙ্করের উপন্যাসে চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতিফলন

এই পরিচ্ছেদে আমরা রবীন্দ্রোত্তর পর্বের যথার্থ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপ এবং রাঢ় বাংলার আউল- বাউল-বোষ্টম ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের জীবন চিত্রের প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন এমন এক সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি করেছিল যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্যে সুবিস্তৃত। বিশেষত তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতি ও বৈষ্ণব সমাজের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর 'রসকলি', 'রাইকমল', 'মালাচন্দন', 'প্রসাদমালা', 'রাধা', 'কবি', 'স্বর্গমর্ত্য', 'রাধারাণী' প্রভৃতি উপন্যাস ও ছোটগল্পে। এই উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি বিস্তৃত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখেছি শ্রীচৈতন্যদেবের বৃহৎ গণ আন্দোলনের পটভূমিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বিপরীতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষকে হরিভক্তি সূত্রে একত্রিত করার যে আদর্শ ব্রাহ্মণ-শূদ্র-চণ্ডালকে সমমর্যাদা দানে ও সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিল চৈতন্যদেবের সেই উদার মানবধর্মই পরবর্তীতে যেসকল সাধারণ মানুষ মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল সেই জাত বৈষ্ণব সমাজ ও সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবন চিত্রের বাস্তব সত্য চিত্রের প্রতিফলনই ঘটেছে এখানে। সেইসঙ্গে রাঢ় বাংলার পটভূমিতে বৈষ্ণবীয় ভাব পরিমণ্ডল, বাউল বৈষ্ণবের

নিয়ম-কানুন, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-বিশ্বাস-সংস্কার, আখড়া নির্মাণ, রসকলি, মালাচন্দন, মাধুকরী, সমাধি, শ্রীচৈতন্যদেব, মহাজন পদাবলী, বৈষ্ণব ভিখারী, মোহান্ত, কীর্তনীয়া প্রভৃতি নানা অনুষঙ্গে পরিপূর্ণ এই রচনাগুলি। আমরা আরও দেখেছি কীভাবে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী এই পল্লীবাংলার মানুষগুলির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে যায়। কমলিনীকে দেখে রসিকদাস গান ধরে – 'বহুদিন পরে বঁধুয়া আইল।/ দেখা না হইত পরাণ গেল।'[৮] আবার কখনওবা গায় –

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।"[৯]

আবার কখনো কমলিনী গুনগুন স্বরে গেয়ে ওঠে –'সখি বলিতে বিদরে হিয়া/ আমারই বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।'[১০] কেবল তাই নয় ঝুমুর দলের মেয়ে বসনের কণ্ঠেও শোনা যায় চণ্ডীদাসের পদের অনুসরণ -

"তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,

জাতিকুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।"[১১]

স্বভাবতই আমরা বুঝতে পারি চণ্ডীদাসের বিখ্যাত নিম্নলিখিত এই পদটিই বসনের কণ্ঠে ভিন্নরূপে উচ্চারিত হয়েছে -

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।

দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি

কুল শীল জাতি মান ।।"[১২]

এইখানে আমরা লক্ষ করি বৈষ্ণব ধর্মের উদারতার সুবাদে চৈতন্যদেব নারীকেও যে কীর্তনের অধিকার দিয়েছিলেন, তারই প্রভাবে আমরা বারাঙ্গনা বসনের কণ্ঠেও বৈষ্ণব পদাবলীর সুর শুনতে পাই। আমরা দেখতে পাই চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রেক্ষিতে নারীর সাম্য,

স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের যে পথ সূচিত হয়েছিল, তারই সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি রূপে তারাশঙ্করের রচনায় নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর ‘রসকলি’, ‘রাইকমল’, ‘রাধা’, ‘স্বর্গমর্ত্য’ প্রভৃতি উপন্যাসে। আর বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্করের সৃষ্ট রসকলি, রাইকমল, রাধা, বসন, ব্রজবাসিনী, তুলসী স্বাধীন ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্র হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি কীভাবে ‘রাধা’ উপন্যাসে একদিকে যেমন বৈষ্ণবধর্মের অবক্ষয়ের চিত্র ধরা পড়েছে অপরদিকে সেই অবক্ষয়ের বিপরীতে দাঁড়িয়ে চৈতন্যের প্রেমধর্ম তথা রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে বাস্তবের রাধা মোহিনী চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে, আবার বাৎসল্য রসের ফল্গুধারা ‘স্বর্গমর্ত্য’ উপন্যাসে বোষ্টমীর জীবনকে প্রবাহিত করেছে। সর্বোপরি চৈতন্যদেবের প্রভাবে সমাজের নিম্ন বর্ণেরাও যে উত্তর চৈতন্যযুগে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল তাঁর সার্থক দৃষ্টান্ত তারাশঙ্করের ‘কবি’, ‘নিশিপদ্ম’ প্রভৃতি উপন্যাস যেখানে সমাজের প্রান্তে বসবাসকারী হীনবৃত্তিধারী মানুষগুলির উন্নততর জীবনে উত্তরণের বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে। প্রতিটি উপন্যাস বিস্তৃত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমরা এই পরিচ্ছেদের আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ‘ত্রয়ী’ উপন্যাসে চৈতন্য প্রসঙ্গ

বিংশ শতকের আর এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীও তাঁর উপন্যাসে রাঢ় বাংলার পটভূমিতে চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণবজীবনের সহজ-সরল বাস্তব চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন, সেইসঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর স্বতন্ত্র মানবিকতাবোধকে। বিশেষত ‘নতুন ফসলে’র ত্রয়ী উপন্যাস (‘ময়ূরাক্ষী’, ‘গৃহকপোতী’, ‘সোমলতা’) - এ ধরা পড়েছে চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণবতার নানা ছাপ। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন “বৈষ্ণব জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ‘ময়ূরাক্ষী’, ‘গৃহকপোতী’, ‘সোমলতা’ তিন খণ্ডে রচিত উপন্যাসাবলী উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বৈরাগী-বৈরাগিনীরা সমাজ জীবনের সহিত বেশ সুসম্বন্ধ – অতিরিক্ত আদর্শবাদের দ্বারা স্ফীত ও বাষ্পায়িত হয় নাই। ইহারা অনেকটা উদাসীন, নীড় রচনায় ঐকান্তিক আগ্রহহীন; সমাজের

সহিত সংস্রবও অনেকটা শিথিল। মনে সংস্কারহীন মুক্তির আনন্দ, মুখে গানের ফোয়ারা, সমাজের নৈতিক শাসন অপেক্ষা স্বাধীন খেয়ালের দ্বারাই ইহাদের জীবন অধিকতর নিয়ন্ত্রিত। সাধনায় আড়ম্বর নাই, বিধিনিষেধের কঠোরতা নাই। তবে এই বৈষ্ণব সাধনা যে জীবনের উপর সত্যই প্রভাবশালী তাহা প্রমাণিত হয় চিত্তের নির্মল শান্তিতে ও পারিবারিক বন্ধনের মোহমুক্ত শিথিলতায়।"[১৩] এইভাবে শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম পরবর্তীতে সমাজজীবনে কীরূপ নেয়, সাধারণ গ্রাম্য মানুষের জীবন সাধনার সঙ্গে, জীবনযাপনের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম কীভাবে অন্বিত হয়ে যায় তারই বাস্তব সত্য চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় সরোজকুমার রায়চৌধুরীর এই 'ত্রয়ী' উপন্যাসে। এ বিষয়ে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। এভাবেই আধুনিক কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে চৈতন্য-চর্চার ধারা অব্যাহত থাকে এবং চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব কথাসাহিত্যে ফুটে ওঠে।

পঞ্চম অধ্যায়: বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কথাসাহিত্যে চৈতন্যচর্চার নবনিরীক্ষণ

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত উপন্যাসে কীভাবে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ঘটেছে, আধুনিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেবের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে, নবনিরীক্ষণে চৈতন্যচর্চার ধারা কীভাবে বাংলা উপন্যাস শিল্পে প্রতিফলিত হয়েছে তাই নিয়েই আলোচনা করেছি। তারাশঙ্করের উপন্যাস ও ছোটগল্পে আমরা রাঢ় বাংলার পটভূমিতে বৈষ্ণব আখড়াকে কেন্দ্র করে বোষ্টম-বোষ্টমীর জীবন আবর্তিত হতে দেখেছি আর সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'দিগ্‌ভ্রান্ত' (১৯৬৬) উপন্যাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমিতে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আশ্রমকে কেন্দ্র করে তথাকথিত শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত একটি পরিবারের সদস্যদের জীবনাবর্তের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। এই উপন্যাসে বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ এবং বৈষ্ণবদের আশ্রমকেন্দ্রিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে। বৈষ্ণব আশ্রমের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার কীভাবে অতসীবালা, সুশীল ও মণির জীবনকে প্রবাহিত করেছে তাই নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব

ধর্ম পরিবর্তিত রূপ লাভ করে সমাজজীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার চিত্রই আমরা উপন্যাসে প্রতিফলিত হতে দেখি।

ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণের পুরোধা চৈতন্যদেব। বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সর্বত্র তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল এই মহান ব্যক্তিত্বের তিরোধান রহস্যাবৃত। জীবৎকালেই যিনি অবতারজ্ঞানে পূজিত হয়েছেন, ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষদর্শীরা যাঁর জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন, ভক্তজনেরা অষ্টপ্রহর যাঁকে চোখে চোখে রেখেছেন, তাঁর তিরোধান সম্পর্কে নীরবতা সত্যিই বিস্ময়কর। আর এই বিস্ময়ের বিষয়কেই একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর রূপদান করেছেন ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘কাহাঁ গেলে তোমা পাই’ (১৯৭৬) উপন্যাসে। চৈতন্যদেবের তিরোধান নিয়ে তিনি চৈতন্যচরিতকার জয়ানন্দ, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, মাধব পট্টনায়ক, বৈষ্ণবচরণ দাস থেকে শুরু করে রোমা রোঁলা, দীনেশ চন্দ্র সেন, বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখদের বক্তব্যকে যেভাবে তুলে ধরে প্রায় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা কতটা যুক্তিসঙ্গত গ্রহণযোগ্য তাও আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি।

আবার কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘সাগরিক’ উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের নানান দিক সমাজ সংস্কারক রূপে তাঁর ভূমিকা, বিধর্মী শাসকের হাত থেকে হিন্দুধর্ম রক্ষা, সর্বোপরি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভেদ-বৈষম্য দূর করে সাম্য ও ঐক্যবোধ প্রচার প্রভৃতি চৈতন্যদেবের নানাবিধ ভূমিকা সাম্প্রতিক কালের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে যে নবজাগরণ এসেছিল সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি ‘সাগরিক’ উপন্যাসে লিখেছেন –“ কিন্তু সমাজেই বলুন আর সাহিত্যেই বলুন, বাংলাদেশে চৈতন্যই প্রথম ডিমোক্র্যাসির বন্যা এনে দিয়েছে। ··· মনের বন্ধনটা ঘুচল বলেই বাংলা সাহিত্যে কী বিরাট একটা স্বর্ণযুগ গড়ে উঠল সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সাহিত্যের উৎকর্ষই জাতির একটা রেণেসাঁসের লক্ষণ।”[১৪] এইভাবে ঔপন্যাসিকের হাত ধরে চৈতন্যব্যক্তিত্ব নতুন মাত্রা পায় আর বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় চৈতন্যচর্চার ধারা অব্যাহত থাকে।

কথাসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র চিরাচরিত বিষয় নিয়েই যার উপন্যাসগুলি বিখ্যাত; শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী নিয়ে রচিত তাঁর উপন্যাস ‘কান্তাপ্রেম’(১৯৮৪)। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে’র মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই গোদাবরী তীরে রায়-রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আলোচনায় শ্রীচৈতন্যদেব যখন একের পর এক সাধ্যকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকেন তখন শেষ পর্যন্ত রামানন্দ বলেন ‘কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার’। “রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব সাধ্যসার··· / পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে / এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।”[১৫] এই সাধ্য শিরোমণি ‘কান্তাপ্রেম’ লাভের আশায় বিশ্বেশর (উপন্যাসের চরিত্র) তথা বিশ্বম্ভর চৈতন্যদেবের জীবন কীভাবে আবর্তিত হয়েছিল তাই নিয়েই গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস ‘কান্তাপ্রেম’। এখানে আমরা দেখতে পাই ঔপন্যাসিক ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে’ বর্ণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পঞ্চরসের উপাদানকে ব্যবহার করেছেন এবং চৈতন্যচরিত্রের মধ্য দিয়ে কীভাবে এই রসগুলি উপলবদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেই পথই বর্ণনা করেছেন।

আবার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু ইতিহাসকে আশ্রয় করে মানবপ্রেমিক ও জনসংঘের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব হিসাবে চৈতন্যচরিত্রের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর কালকূট ছদ্মনামে লেখা ‘জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য’ (১৯৮৭) উপন্যাসে। শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের অলৌকিকতাকে পরিহার করে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনটি পর্বে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার ইতিহাস রচনা করেছেন। উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন চৈতন্য কেবল ধর্মপ্রচারক বা অবতার নন, তিনি একজন রক্তমাংসের মানুষ। তিনি নেতা - তিনি প্রেমিক - তিনি স্বামী - তিনি সন্তান। ঔপন্যাসিকের মতে নেতৃত্বদানের নিমিত্তই চৈতন্যকে অবতারত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল। অবতারত্বের আড়ালে যে সমাজ বদলের স্বপ্ন চৈতন্যদেব দেখেছিলেন তা প্রকৃত দেশনেতার স্বপ্ন। শচীমাতার হৃদয়কে শূন্য করে দেশমাতার জন্য শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে হল। চৈতন্যদেবের জীবনের অধ্যায়গুলিকে যেমন একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তাঁকে করে তোলা যায় ঘরের ছেলে, আবার বর্তমান যুগসংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর মত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর গুরুত্বও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ইতিহাসের আশ্রয় নিয়ে

ঔপন্যাসিক দেখান যে জনমনে তাঁর নেতৃত্ব, তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু তিনি চিরকালের ‘জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য’ হয়ে বেঁচে থাকেন মানুষের মনে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : একবিংশ শতকের উপন্যাসে নববীক্ষণে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব

এভাবেই কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে চৈতন্যদেবের প্রভাব ও চৈতন্যচর্চার ধারা নব নব রূপে নবতাৎপর্যে একবিংশ শতকেও বাংলা উপন্যাস শিল্পে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজও চৈতন্যদেবের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়ে চলেছে একের পর এক উপন্যাস। কোথাওবা নায়করূপে চৈতন্যব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ ঘটেছে, কোথাওবা তাঁর পদরেণুধন্য বিশিষ্ট স্থানগুলি নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে, কোথাও বা তাঁর সমসময়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পটভূমিতে ঔপন্যাসিকের কল্পনা আবর্তিত হয়েছে। আবার চৈতন্যদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কোনো কোনো উপন্যাস যেন হয়ে উঠেছে বর্তমানের প্রেক্ষিতে মধ্যযুগের নবনির্মাণ। আমাদের গবেষণা পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা ‘একবিংশ শতকের উপন্যাসে নববীক্ষণে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব’এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ২০০১ সালে শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রচিত ডঃ দীপক চন্দ্রের ‘সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ উপন্যাসটি। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে সমাজজীবনে যে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, যে মানবতার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কালক্রমে ভক্তের দৃষ্টিতে ভক্তির আড়ালে চৈতন্যদেবের উপর অবতারত্ব দেবত্বের মহিমা আরোপিত হওয়ায় চৈতন্যচরিত্রের সেই মনুষ্যোচিত ভূমিকা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই চৈতন্যচরিতকারদের অলৌকিক ঘটনাগুলিকে যথাসম্ভব পরিহার করে ডঃ দীপক চন্দ্র তাঁর উপন্যাসে চৈতন্যদেবের জীবনের একটি বাস্তব সত্য চিত্র রচনা করেছেন। যেখানে তিনি চৈতন্যদেবের প্রতিবাদী গণশক্তির জাগরুক সত্তার পরিচয় বিধৃত করেছেন, চৈতন্যদেবের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সংঘবদ্ধ করার চিত্র রচনা করেছেন, হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পটভূমি রচনা করেছেন।

আর এভাবেই ‘সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিপ্লবী নায়কের আখ্যান। এখানেই উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা, অভিনবত্ব।

আবার, চৈতন্যদেবের গৌড় তথা রামকেলি পরিভ্রমণকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত অভিজিৎ সেনের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘রাজপাট ধর্মপাট’(২০০৮)। একদিকে গৌড় উড়িষ্যার মুসলিম ও হিন্দু রাজার সংঘাত রাজপাটের নিজস্ব নিয়মে, অন্যদিকে চৈতন্যের নেতৃত্বে ধর্মপাট, এই দুয়ের মেলবন্ধনে এক ক্রান্তিকালের ছবি এঁকেছেন লেখক অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসে। চৈতন্যদেবের গৌড়ে আগমন, রূপ সনাতন উদ্ধার, চৈতন্যদেবের সর্বধর্ম সমন্বনয়ের আদর্শ কীভাবে একটা সময়ের অস্থির জীবনাদর্শের মাঝে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্রিত করল, তাদের উদ্ধারের নিমিত্ত চৈতন্যদেবকে অবতারত্ব গ্রহণ করতে হল, রাজপাটের সঙ্গে কীভাবে ধর্মপাট একাত্ম হয়ে গেল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে এই উপন্যাসে। আর এভাবে ‘রাজপাট ধর্মপাট’ উপন্যাসটি যেন হয়ে উঠেছে বর্তমানের প্রেক্ষিতে মধ্যযুগের নবনির্মাণ।

হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রীচৈতন্য। নবদ্বীপে তিনি গৌরাঙ্গ, গৌর, গোরা নামে পরিচিত। এই গোরা তথা শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়েই শৈবাল মিত্র লিখলেন তাঁর সুদীর্ঘ ও সর্ববৃহৎ উপন্যাস ‘গোরা’ (২০১২)। এই উপন্যাসে লেখক তিন যুগের গোরার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। এযুগের গোরা যে উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলে বাংলা ইংরেজী মিশিয়ে কথা বলে, রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসের গোরা, আর মধ্যযুগের গোরা শ্রীচৈতন্যদেব – এই ত্রিস্তরের বিন্যাসে কীভাবে গোরা উপন্যাসের কাহিনী বিধৃত হয়েছে তাই আমরা এখানে আলোচনা করেছি। উপন্যাসের মধ্যে অন্য এক চৈতন্যকে অনুসন্ধান করেছেন লেখক; ভক্তের চৈতন্য ও ইতিহাসের চৈতন্য এই দুইয়ের মাঝে যে অন্তর্লীন অচেনা চৈতন্য তাঁকেই অনুসন্ধান করেছেন লেখক উপন্যাসে।

শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচশো পঁচিশ বছর স্মরণে রেখে তাঁর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে রূপক সাহা লিখেছেন ‘ক্ষমা কর হে প্রভু’(২০১৩)। চৈতন্যদেবের মৃত্যু রহস্য বর্তমানে একটি

বহু আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। অনেকেই এই বিষয় নিয়ে লিখেছেন ঠিকই তবে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রূপক সাহা যেভাবে ঘটনাগুলিকে সাজিয়েছেন তাতে, তাঁর যথেষ্ট অনিসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগের চৈতন্যচরিতকাব্যগুলি যেমন তিনি অনুসরণ করেছেন, উড়িয়া মালিকা সাহিত্য থেকে উপাদান নিয়েছেন তেমনি সাম্প্রতিককালে চৈতন্যচর্চার ধারাকেও তিনি গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য উপন্যাসের মধ্যেই তিনি দলিত সম্প্রদায়ের বঞ্চনা, মতুয়া সম্প্রদায়, পুরীর দেবদাসী প্রথা, চৈতন্য বিরোধী চক্রের সক্রিয়তা, চৈতন্যদেবের পুনর্জন্ম নিয়ে গবেষণা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীতের রূপরেখা রচনা করে লেখক একই সঙ্গে যেমন ষোড়শ শতকের পটভূমিতে চৈতন্যদেবের জীবন বৃত্তান্ত রচনা করেছেন, তেমনি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে চৈতন্যদেবের আদলে দলিত সম্প্রদায়ের নেতা রূপে গোরা চরিত্রকে নির্মাণ করে সমসময়কে রূপদান করেছেন।

আবার চৈতন্যদেবের পদরেণুধন্য পানিহাটি গ্রামকে কেন্দ্র করে ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘পানিহাটা’। একদা শ্রীচৈতন্যদেব গৌড় পরিভ্রমণের পর নীলাচল প্রত্যাবর্তনের পথে পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হয়ে শাকান্ন ভোজন করেন। চৈতন্যদেবের পানিহাটি আগমন ও সেই সূত্রে সোদপুরের পানিহাটা জনপদের পাঁচশ বছরের ইতিহাসকে লেখক এখানে সাহিত্যরূপ দান করেছেন। পানিহাটি গ্রামটি গঞ্জত্ব হারিয়ে মফফসল থেকে ধীরে ধীরে শহর হয়ে উঠলেও তা যে আজও চৈতন্যদেবের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে; এই প্রসঙ্গে অতীত বনাম বর্তমানের বিভিন্ন দ্বন্দ্বে লেখক সমাজজীবনের বিভিন্ন প্রান্তকে ছুঁয়ে গেছেন। সেইসঙ্গে বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য, মধুর রসের ভজনা, সখিভাবে ভজনা, গৌর নাগরী ভাবে ভজন পূজন, শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে সংকীর্তন, মহোৎসব প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখক ‘পানিহাটা’ উপন্যাসে চৈতন্য-সংস্কৃতির নবতর ব্যঞ্জনা উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ড. সত্যবতী গিরি ‘আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান’ প্রবন্ধে বলেছেন “ পানিহাটা উপন্যাসে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিষয় লক্ষণীয়, তিনি প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের বাংলার যে জনপদ এক একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল সেটাই এখানে বলতে চেয়েছেন। যে কারণে রবীন্দ্রনাথের পেনেটির বাগানবাড়িতে থাকার প্রসঙ্গগুলি খুব লোভনীয় হওয়া সত্ত্বেও

ঔপন্যাসিক বাদ দিয়েছেন। তার মানে ঔপন্যাসিক পানিহাটায় চৈতন্য-সংস্কৃতি কতটা গভীর সেটাকেই তিনি দেখাতে চেয়েছেন।"[১৬]

এছাড়া আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে আরও বেশ কিছু উপন্যাসের আলোচনা। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গৌড়বঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়ের লীলা পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'চেনা পথ অচেনা পথিক' যেখানে গৌড়ের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, প্রেম-অপ্রেমের কথামালাই উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

অলখ মুখোপাধ্যায়ের 'এক জন্মেই জন্মান্তর' (২০১৪) যেখানে নিমাইয়ের জীবন-দর্শন, অনুভব, উপলব্ধিকে লেখক যেমন নতুনভাবে তুলে ধরেছেন তেমনি ষোড়শ শতাব্দীর পটভূমিতে নবদ্বীপের সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়কে শিল্প রূপ দিয়েছেন মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের পটভূমিকে অবলম্বন করে।

চৈতন্যদেবের আদিলীলা নিয়ে রচিত কিন্নর রায়ের 'শ্রীচৈতন্য কথা' (২০১৮) যেখানে চৈতন্যের জন্মের পূর্ববর্তী শচীর মৃত অষ্টকন্যার জন্ম রহস্য নিয়ে লেখকের কল্পনা আবর্তিত হয়েছে, সেইসঙ্গে শ্রীচৈতন্য, তাঁর পরিবার, পূর্বপুরুষ-পূর্বনারীদের আবাসভূমি অখণ্ড বঙ্গের শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণের কথা, কুশিয়াড়া নদীর বিবরণ সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং হাল আমলে বসন্ত লস্করের 'মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য'(২০২০) যেখানে গ্রাম বাংলার পটভূমিতে বেড়ে ওঠা একটি নিতান্ত সাধারণ ছেলে নিমাইয়ের প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-যন্ত্রণা এবং পরিশেষে জননায়ক হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে একেবারে সহজ-সরল ভাষায়। এই উপন্যাসগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে ঔপন্যাসিকের কলমে বাংলা কথাসাহিত্যে একদিকে যেমন চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, চৈতন্য সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত থাকে অপরদিকে চৈতন্যব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ও বিনির্মাণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলে।

সপ্তম অধ্যায় : বাংলা ছোটগল্পে চৈতন্য প্রসঙ্গ ও বৈষ্ণব অনুষঙ্গ

ছোটগল্প যা অনন্তে প্রসৃত মানব জীবনের রূপকে একটি মুহূর্তের অতলে একান্ত করে ব্যঞ্জিত করে তোলে সেই ছোটগল্পেও বিবিধ প্রসঙ্গে ঘুরে ফিরে এসেছে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ ও বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ। ছোটগল্পের প্রথম যথার্থ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ স্বনামধন্য কথাশিল্পীদের রচিত বিবিধ ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করেছি।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত 'বোষ্টমী' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ আনন্দি বোষ্টমীর মধ্য দিয়ে যথার্থ বৈষ্ণবের এক স্বতন্ত্র রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। বোষ্টমীর সহজ সরল জীবনধারণ, কথাবার্তা, ব্যবহার, ঈশ্বরের প্রতি অকুন্ঠ ভক্তি, যে কোনো সুন্দরের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ উপলব্ধি – তাকে যথার্থ বৈষ্ণবীয় প্রেমের মূর্তিস্বরূপিনী করে তুলেছে। লেখক তাঁর মধ্য দিয়ে এক নৈব্যক্তিক সর্বজনীন প্রেমভক্তির রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ---" মানুষের সেবাতেই ঈশ্বরের সেবা। শিলাইদহের বৈষ্ণবীর আচরনে এই সত্যের আভাস পেয়েছিলাম।"[১৭] গল্পে বোষ্টমীর কথাতেও তারই উল্লেখ রয়েছে " তাহার কথাটা এই যে, শুধু মত লইয়া কী হইবে- সত্য যে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী। এটা একটা কথা, কিন্তু যেখানে আমি তাহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।"[১৮] জীবের মধ্য দিয়েই যে রসস্বরূপ ঈশ্বরের প্রকাশ বৈষ্ণবীর ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের কাছে তা আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আনন্দী বোষ্টমীর বৈষ্ণবতা শাস্ত্রীয় নয়, প্রাকৃত। সে তার গুরুকে দেখেছে গৌরের মূর্তিতে কিন্তু গুরু তার ভক্তির মান রক্ষা করতে পারে নি। উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে ধর্মাধিকারি গুরু ঠাকুরের গোপন লালসাবৃত্তি। পরিণামে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছে আনন্দী বোষ্টমীকে। রবীন্দ্রনাথ বার বার সচেতন করে দিয়েছেন যে রসসম্ভোগের মাত্রাতিরিক্ততা পরিণামে বিকারের রূপ নেয়। এর দৃষ্টান্ত আমরা 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার মধ্যে, 'উদ্ধার' গল্পে গৌরীর বিষপান করে সহমৃতা হওয়ার ঘটনাতেও দেখতে পাই। বৈষ্ণবধর্মের এই দুর্বলতার দিকটি সম্পর্কে চৈতন্যদেবও ওয়াকিবহাল ছিলেন। এজন্য তিনি নিজে যেমন কঠোর সংযম

রক্ষা করে চলতেন, তেমনি শিষ্যদেরও সংযমী জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করতেন।

চৈতন্যদেব যে কীর্তন গানের মাধ্যমে সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিরাট প্লাবন নিয়ে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সানন্দে সেই কীর্তনকে গ্রহন করে তাকে আরও ব্যাপ্তি দিলেন সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ; কখনো চরিত্রের মনঃবিশ্লেষণে, কখনো পরিস্থিতি পরিস্ফুটনে, কখনো বা প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায়। কখনো মহেন্দ্রের মনের প্রসন্নতা বোঝাতে লেখক বৈষ্ণব ভিক্ষুকের খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন গানের কথা উল্লেখ করেন (২৯ পরিচ্ছেদ, 'চোখের বালি'), কখনো বিনয়ের মনোভাব প্রকাশে বাউল সঙ্গীতের প্রসঙ্গ আনেন: ''আলখাল্লা পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়, / ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়'।''[১৯] (গোরা,প্রথম পরিচ্ছেদ)। আবার 'পোস্টমাস্টার' গল্পে পল্লীপ্রকৃতির নিপুণ বর্ণনায় উঠে আসে বাউলদের কীর্তন গানের প্রসঙ্গ : ''সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কূণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃ স্বরে গান জুড়িয়া দিত----''।[২০] আবার 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে নিবারণের নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাত্রার পারিপার্শ্বিকে এসেছে 'বৈষ্ণব ভিখারির গানে'র প্রসঙ্গ। সর্বোপরি কীর্তন গানের সার্থক ব্যবহার লক্ষ করা যায় 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে শশিভূষণের মনঃচরিত্র বিশ্লেষণে। জেলফেরত শশিভূষণকে তার প্রিয়জনই যে আহ্বান করে নিয়ে যাচ্ছে তারই গীতিমধুর ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয় এই পদটিতে –

''এসো এসো ফিরে এসো – নাথ হে, ফিরে এসো
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
বঁধু হে ফিরে এসো।''[২১]

এইভাবে চৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তন গান বাংলা ছোটগল্পের শিল্পরূপে নব নব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্পটিতে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি বারাঙ্গনা বিজলী তার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করেছে বৈষ্ণব পদাবলী গেয়ে। আবার 'পথনির্দেশ'

গল্পের শেষাংশে হেমনলিনীর প্রতি গুণেন্দ্রের আদেশে ফুটে উঠেছে রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহের ছবি : "যখন বুঝবে, সংসারে ভালোবাসাকে মহিমান্বিত করার জন্য বিচ্ছেদ শুধু তোমার মত অতুল ঐশ্বর্যশালিনীর দ্বারে এসেই চিরদিন হাত পেতেছে, সে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র কুটীরে অবজ্ঞায় যায় নি – তখনই সহ্য করতে পারবে৷ যখন জানবে, অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবেই সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতেই মধুর, তখনই সইতে পারবে হেম৷"[২২] এইভাবে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পে যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তেমনি বেশ কিছু ছোটগল্পে চৈতন্যদেবের আদর্শের তথা বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিফলনও লক্ষ করা যায়৷

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র ঘনশ্যাম একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব৷ বৈষ্ণব ধর্মের আচার পরায়ণতার উর্দ্ধে এই ধর্মের মূল সত্যটিকে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন ও আপন জীবনে তা পালন করেছেন৷ তাঁর উক্তিঃ " আমি বোষ্টম, আমার তো নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই৷ মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন৷"[২৩]

'চৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লিখিত 'শিক্ষাষ্টক' এর তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে :

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।"[২৪]

সে কথাই ঘনশ্যাম আন্তরিক নিষ্ঠায় পালন করেছেন নিজের জীবনাচরণে৷ স্ত্রী সৌদামিনিকে তিনি বলেছেন " যে সত্যি ক্ষমা চায় তাকে করতেই হবে, এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো৷"[২৫] তাই তো রাতের অন্ধকারে নরেনের সঙ্গে পালিয়ে গেলেও স্ত্রীর এত বড় অন্যায় অপরাধ তিনি ক্ষমা করতে পেরেছেন হৃদয়ের সহজাত ঔদার্য্যে৷ তাকে দেখে সৌদামিনির মনে হয় "মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয় কবচের মতই যে তার মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষা

করতো, আমার তীক্ষ্ণ শূলও খান খান হয়ে পড়ে গেল।"[২৬] এইখানে মহাপ্রভুর আদর্শের গভীর প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ঘনশ্যাম চরিত্রে।

চৈতন্যদেব ছিলেন প্রকৃতই পতিতপাবন। হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতায় নিপীড়িত মানুষ, কথায় কথায় যাদের জাত যায়, সেই সকল সমাজবিচ্যুত বঞ্চিত মানুষ চৈতন্যদেবের প্রচেষ্টায় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে পুনরায় সমাজে তাদের প্রাপ্য সন্মান ফিরে পায়। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'একাদশী বৈরাগী' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পে দেখা যায় একটি অসহায় বিধবা মেয়েকে তার প্রথম জীবনের পদস্খলনের জন্য সমাজ অচ্ছুত করে রাখে, আর তাকে সাহায্য করার জন্য তার পরমাত্মীয়কে পর্যন্ত সমাজবিচ্যুত করা হয়। "··· অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা- নাপিত-মুদি প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল।"[২৭] হিন্দু সমাজের এই নির্মমতার প্রতিবাদে বৈষ্ণব সমাজ এই অসহায়দের স্থান দিয়ে মানবিকতার পরিচয় বহন করে। এখানেই শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নব্য বৈষ্ণবধর্মে পতিতদের উদ্ধারের বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে।

এই গল্পগুলিতে উঠে আসে রক্তমাংসে গড়া বাস্তব মানুষের কথা। আর এগুলি থেকেই বোঝা যায় চৈতন্যদেবের মৃত্যুর শত শত বৎসর পরেও বৈষ্ণবধর্ম তথা বৈষ্ণব সমাজ আজও হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা থেকে অত্যাচার থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করে চলেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাধারানী' গল্পে দেখা যায় কুলহারা বারাঙ্গনার সন্তান গৌরদাস কৃষ্ণযাত্রা পালায় শ্রীমতি রাধার ভূমিকায় অভিনয় করে। তার সম্পর্কে যাত্রা দলের অধিকারীকে বলতে শোনা যায় "রাধাকৃষ্ণের লীলায় ওকে রাধা সাজাই; সেই পুন্যে ওর পাপ ধুয়ে মুছে যাবে বলেই আশা করি। ভাল করে একটু অধিকার হলেই আমি ওকে বৈষ্ণব করে দোব। মহাপ্রভুর মহাধর্মে তো জাতি-কুলের বিচার বড় নয় - সে বাধাও নাই;"[২৮] এইখানে সামাজিক সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৈষমের উর্দ্ধে চৈতন্যদেবের উদার মানবধর্মেরই জয়ধ্বনি শোনা যায়। এ প্রসঙ্গে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য -" ঠিক যাহাকে সমাজ সংস্কার বলে বা য়ুরোপীয় আদর্শে যাহা 'humanism' নামে পরিচিত, চৈতন্যদেব সজ্ঞানে তাহার প্রবক্তা বা প্রচারক ছিলেন না ঠিকই; কিন্তু চৈতন্য প্রভাবে সমাজের নিম্নবর্ণেরাও যে উত্তর চৈতন্য যুগে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার্য।"[২৯]

চৈতন্যদেবের এই সাম্যের আদর্শ কেবল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেই যে মানুষকে উদ্ধার করেছিল তাই নয়, এই ধর্মনীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ শ্রেনির মানুষকেও যে উদ্ধারের পথ দেখিয়েছে, তাদের আত্মমর্যাদা বোধে উদ্দীপিত করেছে বাংলা ছোটগল্পগুলি তারই সার্থক নিদর্শন বহন করে। এই নিদর্শন আরও সার্থকতা লাভ করে রাঢ় বাংলার বিখ্যাত ছোটগল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে। তাঁর রচনায় রাঢ় বাংলার পটভূমিতে বাউল-বোষ্টম-বৈরাগীদের জীবন ও জীবিকার, লোকায়ত বৈষ্ণব ধর্মের, বৈষ্ণব সমাজ ও সংস্কৃতির বাস্তব সত্য চিত্রই প্রতিফলিত হয়ে ওঠে ‘রসকলি’, ‘মালাচন্দন’,’প্রসাদমালা’, ‘রাধারাণী’, ‘পৌষলক্ষ্মী’, ‘যাদুকরী’ প্রভৃতি ছোটগল্পে। প্রতিটি গল্প নিপুণ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কীভাবে গ্রামবাংলার লোকায়ত জীবনে চৈতন্যদেবের মানবধর্মের প্রতিফলন ঘটেছে, লোকজীবনে বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতি ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব কতখানি সুদূরপ্রসারী।

আবার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চুয়াচন্দন’ গল্পে একদিকে আত্মবিশ্বাসী, বিদ্যার অহংকারে দৃপ্ত, নির্ভীক, অসীম সাহসী নিমাইয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির, কৌতুক রসপ্রিয়তার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, অপরদিকে মহাশ্বেতা দেবীর ‘বান’ গল্পে চৈতন্য প্রেমের বানের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এছাড়া দশদিশি পত্রিকায় সম্পাদিত দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়ের ‘পৌর্ণমাসী’ ও গৌতম ঘোষের ‘সন্ধিক্ষণ’ ইত্যাদি গল্প নিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনাকে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

উপসংহার

এভাবেই বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় চৈতন্যদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের প্রতিফলন বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের শিল্পরূপে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। আর এগুলি থেকে আজকের পাঠক যেমন সাহিত্য রস আস্বাদন করে তেমনি তাদের সামনে চৈতন্যদেবকে নিয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবনা-চিন্তার দ্বার উন্মোচিত হয় এবং নববীক্ষণে চৈতন্যদেবকে নিয়ে গবেষণার পথ আরও আরও প্রসারিত হতে থাকে।

তথ্যসূত্র

(১) বসু তাপস, শ্রীচৈতন্য: একালের ভাবনা, গিরি সত্যবতী, শ্রীচৈতন্য ও বাংলা সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃ-৩৮৬।

(২) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৬৫, পৃ-৩।

(৩) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা.), জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, উত্তর খণ্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬, পৃ-২৩৪।

(৪) চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, আনন্দমঠ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দেজ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ- ৯২১।

(৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পত্র ৬, বিশ্বভারতী, পৃ- ৫২৮।

(৬) তদেব।

(৭) তদেব, পৃ- ৫২৯।

(৮) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, রাইকমল, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৮, পৃ- ৪০৬।

(৯) তদেব, পৃ-৪১১।

(১০) তদেব, পৃ-৪৩৯।

(১১) তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, কবি, ১৩৫৯, পৃ- ৮৩।

(১২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী চয়ন, ২০১১, পৃ- ৮৩।

(১৩) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., ১৯৬৫, পৃ- ২৯৫।

(১৪) গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, সাগরিক, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৭, পৃ- ৩০।

(১৫) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯২, পৃ-১৭৮।

(১৬) সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, গিরি সত্যবতী, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১, পৃ- ৯৯।

(১৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, পত্র ১৯৯, বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃ- ৩১৯।

(১৮) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯২৭, কলকাতা-১৭, পৃ- ৬৬১-৬৬২।

(১৯) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, গোরা, প্রথম পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, ১৩৯৭, পৃ- ৫০৯।

(২০) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, অখণ্ড সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৫, বিশ্বভারতী, পোষ্টমাস্টার, পৃ-১৬।

(২১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, মেঘ ও রৌদ্র, পৃ-২০৬-২০৭।

(২২) চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শরৎরচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, পথনির্দেশ, শুভম, ২০১১, পৃ- ৯০১।

(২৩) তদেব, স্বামী, পৃ-৮২৬।

(২৪) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯২,পৃ- ৫০৭।

(২৫) চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শরৎরচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, স্বামী, শুভম, ২০১১, পৃ- ৮৩০।

(২৬) তদেব, পৃ- ৮৩৪।

(২৭) তদেব, একাদশী বৈরাগী, পৃ- ১০২৬।

(২৮) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, রাধারানী, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, পৃ- ৪১৩।

(২৯) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৮৩, পৃ- ১২৫।

গ্রন্থসূচি

আকর গ্রন্থ:

কালকূট, কালকূট রচনাসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৯।

কালকূট, কালকূট রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৯।

গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৭।

ঘোষ শিশির কুমার, শ্রী অমিয় নিমাই চরিত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা -৯, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৯।

ঘোষ বিশ্বরঞ্জন সম্পাদিত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০০।

চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৬ ।

চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, ১৩৬১।

চট্টোপাধ্যায় সাধন, পানিহাটা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪।

চট্টোপাধ্যায় নন্দিনী, চেনা পথ অচেনা পথিক, দেজ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯।

চন্দ্র দীপক, সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, দেজ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০১।

চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর সম্পাদিত, লোচনদাসের ‘শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল’, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, নবম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৭১।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৩।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৩।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৩।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৪।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৭।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৮।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৮।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৭।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৩৫৩।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, অখণ্ড সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৪০৫।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৯২৭।

দাস সজনীকান্ত (সম্পাঃ), নবীনচন্দ্র রচনাবলি, সপ্তম খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-০৬, ১৩৬৬

বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, ১৩৫৭

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, ১৩৫৮

বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলি, পঞ্চম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৫৯

বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলি, ষষ্ঠ খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৫৯

বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলি, অষ্টম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৬০

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৬০

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, আমার কালের কথা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, ১৩৫৮

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, বৈষ্ণবের আখড়া, সাহিত্যপ্রকাশ, কলকাতা-০৯, ১৩৬৭

বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু, চুয়াচন্দন, পি সি সরকার এণ্ড কোং লিঃ, ১৮ শামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৪২

ভাদুড়ী সতীনাথ, সতীনাথ রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, মাঘ ১৪২০

মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা), জয়ানন্দ বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা- ১৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৭১, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬।

মিত্র গজেন্দ্রকুমার, কান্তাপ্রেম, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯০।

মিত্র শৈবাল, গোরা, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, সেপটেম্বর ২০১২।

মুখোপাধ্যায় অলখ, এক জন্মেই জন্মান্তর, কৃতি পাবলিকেশন, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৪।

মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, প্রাচী পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১৭।

রায় কিন্নর, শ্রীচৈতন্যকথা (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারী ২০১৮।

রায়চৌধুরী সরোজকুমার, ময়ূরাক্ষী, নতুন ফসলের প্রথম পর্ব, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-০৯, ১৯৬৪।

রায়চৌধুরী সরোজকুমার, গৃহকপোতী, নতুন ফসলের দ্বিতীয় পর্ব, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-০৯, ১৯৬৪।

রায়চৌধুরী সরোজকুমার, সোমলতা, নতুন ফসলের তৃতীয় পর্ব, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-০৯, ১৯৬৪।

লস্কর বসন্ত, মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য, প্রথম খণ্ড, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, জানুয়ারী ২০২০।

লস্কর বসন্ত, মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য, দ্বিতীয় খণ্ড, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, জানুয়ারী ২০২১।

সাহা রূপক, ক্ষমা কর হে প্রভু, দীপ প্রকাশন, কলকাতা- ৬৭, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩।

সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা -০৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১।

সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯২।

সেন সুকুমার ও মিত্র খগেন্দ্রনাথ (সম্পা.), বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

সেন অভিজিৎ, রাজপাট ধর্মপাট, দেজ, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০৮।

সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার, অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬।

সহায়ক গ্রন্থ :

গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৪০৫।

গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, ছোটগল্পের সীমারেখা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি , কলকাতা- ১২, ১৩৭৬।

গিরি সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৮৮।

গিরি সত্য, বৈষ্ণব পদাবলি, রত্নাবলি, কলকাতা-০৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬।

গিরি সত্যবতী, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চা, দিয়া, কলকাতা – ০৯, ২০১৭।

গুপ্ত নির্মল নারায়ণ, ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য, রত্নাবলি, কলকাতা- ০৯, ১৯৮৬।

গুপ্ত ক্ষেত্র, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা-০৯, ১৯৯৪।

গোস্বামী ননীগোপাল, চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭১।

ঘোষ কানাইলাল, শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাব ভূমি, একুশ শতক, কলকাতা – ৭৩, ২০১৩।

ঘোষ শুভময়, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-আন্দোলন ও বঙ্গনারী, পত্রলেখা, কলকাতা -০৯, ২০২০।

ঘোষ সতী, বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৭।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পা.), চৈতন্য পরিক্রমা, খিদিরপুর হরিসভা, কলকাতা- ২৩, ১৩৯৩।

চক্রবর্তী রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৬।

চক্রবর্তী রমাকান্ত, বাঙালির ধর্ম- সমাজ ও সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা, কলকাতা-০৯, ২০০২।

চক্রবর্তী সুধীর, বাউল ফকির কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, ২০১০।

চক্রবর্তী সুমিতা, উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, ১৯৯৮।

চট্টোপাধ্যায় দুর্গাপদ, শ্রীচৈতন্য অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০।

চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত, বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস, দে'জ, কলকাতা–৭৩, ২০০২।

চৌধুরী নারায়ণ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা-১২, ১৩৬৭।

চৌধুরী ভীষ্মদেব সম্পাদিত, তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৯।

চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, ১৯৯৫।

চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, তৃতীয় পর্যায়, দে'জ, কলকাতা–৭৩, ১৯৯৫।

চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, ১৯৬২।

চৌধুরী ভূদেব, রবীন্দ্র উপন্যাস ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, দেজ, কলকাতা- ৭৩, ১৯৮৪।

চৌধুরী মৈত্রেয়, প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেব, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-০৬, ১৪০৯।

চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, শ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪।

জানা যুধিষ্ঠির (মালীবুড়ো), শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য, ময়না প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, ১৯৮৫।

দে অশোক কুমার, বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-০৯, ১৯৭৪।

দত্ত বিজিতকুমার, চৈতন্য জীবনকথা, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯২।

দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, ১৯৮৫।

দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, ১৯৯৮।

দত্ত ভবতোষ, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, জিজ্ঞাসা, কলকাতা- ০৯, ১৯৭৩।

দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ, কুহু ও কেকা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯২৯।

দাশ শিশিরকুমার, বাংলা ছোটগল্প, দেজ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৩।

দাশগুপ্ত প্রফুল্লকুমার, উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, কলকাতা-১২, ১৩৭৮।

দাশগুপ্ত শশিভূষণ, বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ১২, ১৩৭২।

দাশগুপ্ত শশিভূষণ, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -১২, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩।

দাশগুপ্ত শান্তিকুমার ও গুপ্ত নির্মল নারায়ণ, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রত্নাবলী, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫।

দাস ক্ষুদিরাম, বৈষ্ণব রসপ্রকাশ, এ.কে.সরকার অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা- ১২, ১৯৮২।

দে অশোককুমার, বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৭৩, ১৯৭৪।

দে সত্যব্রত, রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-০৯, ১৯৭১।

নস্কর সনৎকুমার, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা ০৯, ১৯৭১।

পট্টনায়ক মাধব, চৈতন্যবিলাস, বিষ্ণুপদ পাণ্ডা কৃত বঙ্গানুবাদ (শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব), দে’জ, কলকাতা–৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৭।

পাণ্ডা বিষ্ণুপদ, শ্রীচৈতন্য প্রদক্ষিণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৩।

পাল সুকান্ত ও রায় সুব্রত (সম্পা.), নবজাগরণের প্রথম আলো শ্রীচৈতন্য, মিত্রম, কলকাতা - ০৯, জুন ২০১৪।

পোদ্দার অরবিন্দ, বঙ্কিম মানস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৯, ১৯৫১।

বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, ১৯৮৩।

বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, দশম সংস্করণ, ১৯৯০।

বন্দ্যোপাধ্যায় দেবাশিস, চৈতন্যচর্চার পাঁচশো বছর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, ১৯৮৭।

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬৫।

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., ১৯৯৩।

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা-১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯।

বন্দ্যোপাধ্যায় সরিৎ, আমার পিতা তারাশঙ্কর, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, কার্তিক ১৪১০।

বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীলকুমার, উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, ১৯৯৮।

বন্দ্যোপাধ্যায় সুরভি, গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯০।

বসু তাপস (সম্পা.), শ্রীচৈতন্য একালের ভাবনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, ২০১৪।

বসু নিতাই, তারাশঙ্করের শিল্পী মানস, দেজ, কলকাতা- ৭৩, ১৯৭৩।

বিশী প্রমথনাথ, বঙ্কিম সরণী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৮৪।

বিশী প্রমথনাথ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, ১৩৬৬।

ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, বঙ্কিম সাহিত্য, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা-০৩, ১৯৭৮।

ভট্টাচার্য্য জগদীশ, চৈতন্য প্রসঙ্গ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪২১।

ভট্টাচার্য্য জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯।

ভট্টাচার্য প্রদ্যুম্ন (সম্পা), তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা-৩০, ২০০১।

ভট্টাচার্য বিষ্ণুপদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিরস ও অলংকার শাস্ত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ১৪০০।

ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১২ ১৯৮৪।

মজুমদার বিমানবিহারী, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা-৬, জানুয়ারী ২০০৬

মজুমদার বিমানবিহারী, রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৬, ১৩৬৮।

মজুমদার বিমানবিহারী, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৩।

মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলা দেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১৩, ১৯৯৮।

মজুমদার সমরেশ, বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, ১৩৯৩।

মজুমদার সমরেশ, তারাশঙ্করের রাধা দর্শন ও জীবনে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ০৯, ১৪১২।

মজুমদার উজ্জ্বলকুমার (সম্পা.), তারাশঙ্কর দেশ-কাল-সাহিত্য, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ,কলকাতা- ৭৩, ১৩৮০।

মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দেজ, কলকাতা- ৭৩, জুন ২০০৪।

মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দেজ, কলকাতা- ৭৩, ১৯৯৯।

মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দেজ, কলকাতা- ৭৩, ১৯৯৩।

মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনকথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৬।

মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর, চৈতন্যচিন্তা, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, ১৯৯৯।

মুখোপাধ্যায় সুখময়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৬০।

মুখোপাধ্যায় সুখময়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা-১৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০।

মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮০।

রায় গৌরমোহন, তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা- ০৯, ১৯৯৪।

রায় দেবেশ, উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ২০০৬।

রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২।

রায় বিশ্বনাথ, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, ২০০৭।

রায় রামদাস, শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা ও বৈষ্ণব আন্দোলন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৭।

রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ, অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, কলকাতা- ০৭, ১৯৭৭।

রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দেজ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৮০।

রায়চৌধুরী বাঁশরী, জয়ানন্দ ও লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে সমাজচিত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-৬, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮০।

শরীফ আহমেদ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড), বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

শ’ ড. রামেশ্বর, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ০৯।

সর রমেনকুমার, চৈতন্য জীবন – প্রসঙ্গ সেকাল ও একাল, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারী ২০১৬।

সান্যাল অরুণ, প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ১৯৯১।

সিকদার অশ্রুকুমার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা- ০৬, ১৩৯৫।

সিংহরায় গোপীমোহন, রবীন্দ্র সাহিত্যের নরনারী, প্রথম খণ্ড, ভারবী, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৩২।

সেন দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩, ১৯৮৫।

সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, দেজ, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪।

সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, দেজ, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬।

সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, ১৯৭৮।

সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯।

সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬।

সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

সেন সুকুমার, চৈতন্যাবদান, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ১৩৯২।

সেন সুকুমার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৩, কলকাতা-৬।

সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা- ১২, ১৯৭২।

সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৫৫।

হালদার গোপাল, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ডঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা- ০৬, ১৪০০।

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরাজী)

Chakraborty Ramakanta, Vaishnavism in Bengal, 1486-1900, Sanskrit Pustak Bhander, 1985.

De Sushil Kumar, EARLY HISTORY OF THE VAISHNAVA FAITH AND MOVEMENT IN BENGAL, General Printers and Publishers Limited, Calcutta, 1942.

Keneddy, The Chaitanya Movement : A Study of the Vaishnavism of Bengal, Calcutta, 1925.

Mukherjee Pravat, The History of Medieval Vaishnavism in Orissa, Calcutta, 1940.

Pal Bipin Chandra, Bengal Vaishnavism, Modern Book Agency, Calcutta, 1933.

Sen Dinseh Chandra, Chaitanya and His Age, University of Calcutta, 1922.

পত্র-পত্রিকা

গিরি সত্যবতী ও নস্কর সনৎকুমার সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-মাঘ, ১৪০৯।

ঘোষ ঋতুপর্ণ সম্পাদিত, রোববার, প্রতিদিন, সাহা রূপক, ক্ষমা কর হে প্রভু, বি.এল.পাবলিকেশন, ২৭শে জুন, ২০১০।

চক্রবর্তী রমাকান্ত, শরৎ সাহিত্যে ধর্ম, 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, শরৎ সংখ্যা, ১৪০৮।

চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর সম্পাদিত, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, ২০০৪।

মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৪০৪, শতবর্ষে তারাশঙ্কর: লোকজীবন ও সংস্কৃতি, দশম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৪০৪।

সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, গিরি সত্যবতী, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১।

দশদিশি সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত, দশদিশি, বিষয় : শ্রীচৈতন্য, কলিকাতা-০৭, নভেম্বর ২০০৯।

দশদিশি সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত, দশদিশি, বিষয় : শ্রীচৈতন্য, (দ্বিতীয় পর্ব), কলিকাতা-০৭, ২০১৪-২০১৫।

দাস রঞ্জনকুমার সম্পাদিত, শনিবারের চিঠি, তারাশঙ্কর সংখ্যা, ১৯৯৮।

শব্দ সাহিত্য পত্রিকা, কালকূট বিশেষ সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১১।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১-৪ সংখ্যা ১০৩ বর্ষ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৯৮।

তবু একলব্য, সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, ২৫ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ২০২০।

বইয়ের দেশ, জানুয়ারী – মার্চ, ২০২১, এবিপি প্রাঃ লিমিটেড।

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

RAJYESWAR SINHA
Professor and H.O.D.
Department of Bengali
Jadavpur University
Kolkata-32, West Bengal, India

গবেষকের স্বাক্ষর